Everest
Pharmaceuticals Ltd.

ক্যানসার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

অধ্যাপক ডা. এম এ হাই
অধ্যাপক ও পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি হাসপাতাল ও ওয়েলফেয়ার হোম

প্রতিবছর ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'বিশ্ব ক্যানসার দিবস' পালিত হয়।

আমাদের দেশে অনেকগুলো সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নত মানের ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে ক্যানসার চিকিৎসা সংযুক্ত হয়েছে। তবে আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।

ক্যানসার সোসাইটিও যথেষ্ট কাজ করছে। ক্যানসার সোসাইটির একটি বড় উদ্যোগ হচ্ছে, গরিব রোগীদের জন্য রোগী কল্যাণ তহবিল। আমাদের মূলনীতি হচ্ছে চিকিৎসা না দিয়ে আমরা কাউকে ফিরিয়ে দেব না।

গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল—সব ক্ষেত্রে ক্যানসার চিকিৎসায় বৈষম্য আছে। বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। ন্যাশনাল ক্যানসার কন্ট্রোল কাউন্সিলের অস্তিত্ব আছে শুধু কাগজ-কলমে।

ক্যানসার প্রতিরোধে আমাদের দেশে অনেক ওষুধ তৈরি হচ্ছে, যা খুবই মানসম্পন্ন।

ক্যানসার চিকিৎসায় অনেক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। এগুলো সম্পর্কে নার্সদের জানতে হয়। তাই নার্সিং বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যানসার চিকিৎসার মান বাড়াতে তাদের ঠিকমতো প্রশিক্ষণ জরুরি।

ক্যানসার রোগীদের রেজিস্টার তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারিভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ করা সম্ভব হয়নি। আমরা এটা শুরু করেছিলাম শ্রীপুর থানায়। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় ডেমোগ্রাফিক সার্ভে করা হয়েছিল। তারপর করেছিলাম ময়মনসিংহে। নতুনদের বলব, ক্যানসার রেজিস্টার সম্পন্ন করুন।

সর্বোপরি আমি বলব, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। খাদ্যাভ্যাসের জন্য আমরা বেশির ভাগ এসব রোগে ভুগে থাকি। সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, যাতে শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। (অনলাইনে দেওয়া বক্তৃতা)

বিশ্ব ক্যানসার দিবস উপলক্ষে প্রথম আলোর আয়োজনে 'ক্যানসার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সহযোগিতায় প্রথম আলো কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৩০ জানুয়ারি ২০২৪। ছবি : **খালেদ সরকার**

সুপারিশ

- সব বিভাগীয় শহরে রেডিওথেরাপি-সংবলিত আরও ২০টি ক্যানসার হাসপাতাল প্রয়োজন।
- উপযুক্ত ক্যানসার চিকিৎসার জন্য রেডিও অনকোলজিস্ট, মেডিকেল অনকোলজিস্ট, সার্জন, প্যাথলজিস্ট ও মলিকুলার জেনেটিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিউমার বোর্ড গঠন করে সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতি চালু করতে হবে।
- বাংলাদেশের ক্যানসার হাসপাতালগুলোকে বহির্বিশ্বের মতো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে র‍্যাংকিং করতে হবে।
- ক্যানসার শনাক্ত করতে ৪০ বছর বয়স থেকে নিয়মিত ক্যানসার স্ক্রিনিং করতে হবে এবং তা প্রচারে গণধ্যমের আরও ভূমিকা প্রয়োজন।
- ক্যানসার প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ক্ষেত্রে, জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও দক্ষ জনবল গড়তে চিকিৎসক ও নার্সদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে বাল্যবিবাহ, বহুগামিতা, অধিক সন্তান গ্রহণে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং ৯ বছর বয়স থেকে সব মেয়েশিশুকে জরায়ুমুখের ক্যানসারের টিকা দিতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মোয়াররফ হোসেন
সাবেক পরিচালক, জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

১৯৮৮ সালে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যানসার বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলাম। সে সময় সারা বাংলাদেশে ৮ থেকে ১০ জনের বেশি ক্যানসার চিকিৎসক ছিলেন না। বর্তমানে আমাদের প্রায় আড়াই শ ক্যানসারবিশেষজ্ঞ আছেন। এটি বড় একটি অগ্রগতি।

বর্তমানে বিদেশি কোম্পানির পাশাপাশি আমাদের দেশীয় অনেক কোম্পানি আন্তর্জাতিক মানের ক্যানসার চিকিৎসার ওষুধ তৈরি করছে। অনেক ওষুধ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশীয় কোম্পানির ওষুধ আসার ফলে দাম অনেকটা কমে গেছে। দেখা গেছে, যে ওষুধ আগে ছিল দেড় লাখ টাকা, তা পঞ্চাশ হাজারের কমে নেমে এসেছে। ফলে ক্যানসার চিকিৎসা সহজ হয়েছে। ওষুধের বিষয়ে আমি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। ১০ বছর ধরে আমরা দেশীয় ওষুধ ব্যবহার করছি এবং এর কার্যকারিতাও বেশ ভালো। ওষুধের দাম কমাতে গিয়ে কোম্পানিগুলো যেন মানের সঙ্গে আপস না করে।

আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী দেখা যায়। কিন্তু ক্যানসার সেন্টারগুলোতে ৬০ হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসাধীন নেই। তাহলে বাকি রোগীদের কী অবস্থা? তাঁরা কবিরাজি কিংবা পানি পড়ার মতো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। পরে তাঁরা যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন ক্যানসার হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ স্টেজে চলে গেছে। ওই অবস্থায় চিকিৎসা করে ভালো কিছু করা কঠিন। তখন তাঁরা চিকিৎসক বা ওষুধের ওপর দোষারোপ করেন। অনেকে ভাবেন দেশের বাইরে গেলে ভালো চিকিৎসা হতো। সত্যিকার অর্থে এটিই একমাত্র সমাধান নয়। অনেকে তাঁদের একমাত্র সম্বল ভিটেমাটি বিক্রি করেও দেশের বাইরে চিকিৎসা করাতে যান। কিন্তু তাঁদেরও ফিরতে হয় খালি হাতে। তখন তাঁর পরিবারের পথে বসা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

ক্যানসার চিকিৎসায় আমরা অনেক উন্নতি করেছি। ক্যানসার চিকিৎসার তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি। সার্জারি ও কেমোথেরাপি যেকোনো সেন্টারে দেওয়া যায়। কিন্তু রেডিওথেরাপির জন্য উন্নত বিশেষ ল্যাব প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য রেডিওথেরাপি-সংবলিত ক্যানসার সেন্টার প্রয়োজন। সে হিসাবে আমাদের কমপক্ষে ১৬০টি সেন্টার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সেন্টার আছে মাত্র ২২টি। এ ধরনের সেন্টার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক ডা. পারভীন শাহিদা আখতার
সাধারণ সম্পাদক, শান্তি ক্যানসার ফাউন্ডেশন ও প্রেসিডেন্ট, মেডিকেল অনকোলজি সোসাইটি ইন বাংলাদেশ

ক্যানসার চিকিৎসায় উন্নত বিশ্বে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেসব দেশে অধিকাংশ রোগীর ক্যানসার পূর্ব অবস্থায় বা প্রথম স্টেজেই রোগ নির্ণয় হয়। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হয়; নিরাময়ের হার অনেক বেশি। অন্যদিকে আমাদের কাছে রোগীদের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আসেন তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে।

বলা হয়, বর্তমানে ৪০ শতাংশ ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়। ক্যানসার চিকিৎসা একটি সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতি। এটি জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। কেবল কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি বা অস্ত্রোপচার নয়, বরং সব কটি চিকিৎসা সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এর বাইরে অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসাও প্রয়োজন হয়। তাই সমন্বিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত একটি টিম গঠন করে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হলে ক্যানসার চিকিৎসার সুফল পাওয়া সম্ভব।

আমাদের প্রয়োজনীয় ওষুধের ৯০ শতাংশের বেশি ওষুধ দেশীয় কোম্পানি থেকে পাচ্ছি। ফলে ক্যানসার চিকিৎসার খরচ কম এসেছে অনেক গুণ। ক্যানসার কেমোথেরাপি বা ইমিউনো থেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব আমাদের নেই। ওষুধের যথাযথ প্রয়োগের জন্য ল্যাব সুবিধা প্রয়োজন। মলিকুলার টেস্টগুলো না জানলে যথাযথ ওষুধ দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিওথেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসাপদ্ধতি। বর্তমানে রোগীদের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশের রেডিওথেরাপি প্রয়োজন হয়। ক্যানসার নিরাময়, সহায়ক চিকিৎসা, প্যালিয়েটিভের জন্য রেডিওথেরাপি প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় মিলে এ সুবিধা আছে যৎসামান্যই। বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া খুবই জরুরি।

স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হয় এক থেকে দুই শতাংশের মতো। বাকিদের বেশির ভাগেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ক্যানসার ধরা পড়ে। চতুর্থ পর্যায়েও অনেকে আসেন চিকিৎসা করাতে। এর কারণ সচেতনতার অভাব। অধিকাংশ স্তন ক্যানসার নীরব, অর্থাৎ কোনো ব্যথা থাকে না। মানুষ কেবল উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসা করাতে আসেন। অথচ উন্নত দেশে ২৫ শতাংশ রোগী ক্যানসার পূর্ব অবস্থায় শনাক্ত হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণ বলছে, ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের রোগী আমাদের কাছে বেশি আসেন। তাই আমরা বলি, কোনো সমস্যা থাকুক বা না থাকুক, ৪০ বছর বয়স হলেই স্ক্রিনিংয়ে আসতে হবে। স্ক্রিনিংয়ে অংশগ্রহণ করানো গেলে শুরুর পর্যায়েই ক্যানসার শনাক্ত ও চিকিৎসা সম্ভব।

অধ্যাপক ডা. এম এ খান
প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান হেমাটোলজি ও বিএমটি সেন্টার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

আমি একজন হেমাটো-অনকোলজিস্ট, তাই ব্লাড ক্যানসার নিয়ে কথা বলব। ব্লাড ক্যানসারের তিনটি ধরন হলো—লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া ও মাইলোমা। সব ধরনের ক্যানসারের মধ্যে ব্লাড ক্যানসার হলো ৮-১০%, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ লিম্ফোমা, ২৫ শতাংশ লিউকেমিয়া ও বাকি ১০ শতাংশ মাইলোমা-জাতীয় ক্যানসার।

শুরুর দিকে বাংলাদেশে ব্লাড ক্যানসারের চিকিৎসা ও ওষুধ অপ্রতুল ছিল। বর্তমানে প্রায় সব ধরনের ব্লাড ক্যানসারের চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব। ২০০৪ সালের পূর্বে তৎকালীন আইপিজিএমআরে (বর্তমান বিএসএমএমইউ) হেমাটোলজি বিভাগ ছিল। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ক্যানসার ইনস্টিটিউটসহ ১০টি সরকারি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে হেমাটোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৭০ জন রক্তরোগবিশেষজ্ঞ রয়েছেন। এগুলো ক্যানসার চিকিৎসায় একধরনের অগ্রগতি।

আমি স্বপ্ন দেখলাম, বাংলাদেশে বোন-ম্যারো প্রতিস্থাপন পদ্ধতির খুব প্রয়োজন। কারণ, যেখানে কেমোথেরাপি ব্যর্থ হয়, সেখানে বোন-মেরো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আশার আলো দেখায়। আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১৪ সালের ১০ মার্চ প্রথমবারের মতো বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট শুরু করতে পেরেছি এবং আমার সময়কালে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৫২টি বোন-ম্যারো প্রতিস্থাপন সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের যৌথ উদ্যোগ ছিল। এ ক্ষেত্রে আমাদের সফলতার হার প্রায় সমান সমান। আমাদের এসব অর্জনের সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না বলেই তারা বিদেশমুখী হয়।

আজকাল কেমোথেরাপির ধরনে পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ কেমো দিতে ভয় পায়। মনে করে চুল পড়ে যাবে, শরীর শুকিয়ে যাবে, মুখে ঘা হবে ইত্যাদি। এখন এগুলো আর হয় না। কারণ, কেমোথেরাপি দেওয়া হয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী। যে কোষে সমস্যা, ঠিক সে কোষেই ওষুধ কাজ করবে। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে কম এবং নিরাময় হবে দ্রুত।

এখনো ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধের দাম পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় বেশি। রোগীরা উন্নত পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে সিংহভাগ টাকা ব্যয় করে ফেলেন। পরে দেখা যায়, চিকিৎসার জন্য ব্যয় করার টাকা অবশিষ্ট থাকে না। কর মওকুফ করে দেওয়ায় ভারতে ওষুধের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে গেছে। আমাদের চিকিৎসা ব্যয় বেশি। ক্যানসার চিকিৎসায় ধনী-গরিবের চিকিৎসা বৈষম্য দূর করতে সরকার ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী
কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ স্পেসালাইজড হসপিটাল

ক্যানসার রোগের চিকিৎসা আসলে সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এজন্য একটা টিম প্রয়োজন হয় যারা ঠিক করবেন রোগীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে চিকিৎসা চলবে।

এখন প্রশ্ন হল এ বোর্ডে কারা কারা থাকবেন। কোনো চিকিৎসক হয়ত রেডিয়েশন ভালো জানেন, আবার কেউ মেডিকেল অনকোলজি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ টিউমারের কোথায় কেমোথেরাপি দিতে হবে তা ভালো জানে। একজন ইমেজিং স্পেশালিষ্ট থাকবেন যিনি বলবেন ক্যানসার কতটুকু বর্ধিত হয়েছে। একজন প্যাথলজিস্টেরও থাকা প্রয়োজন, তিনি দেখবেন এটি কোন ধরনের কোষ থেকে এসেছে, সত্যিকার অর্থেই ক্যান্সার হয়েছে কি না। এছাড়াও সার্জন থাকবেন, প্যালিয়েটিভ কেয়ার স্পেশালিস্ট থাকবেন।

এখন বলা হচ্ছে ক্যানসার তো মলিকিউলার ডিজিজ, একদম জিনের মধ্য থেকে শুরু হয়েছে। বিগত দশ বছরে ফুসফুস ক্যানসারের ১০ থেকে ১২টি জিন আবিষ্কার হয়েছে। এসব জিনের বিপরীতে চিকিৎসা শুরু হয়েছে, ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে। ট্যাবলেট অনেক সময় কেমোথেরাপির চেয়েও ভালো কাজ করছে। যেখানে কেমোথেরাপি ১২ মাস সুবিধা দিচ্ছে, সেখানে ট্যাবলেট পাঁচ বছর ৬০ শতাংশ রোগীকে সুবিধা দিচ্ছে। অর্থাৎ, একশত জনের মধ্যে ৬০ জনের ক্ষেত্রেই পাঁচ বছর পর্যন্ত রোগ আটকে রাখতে পারছে, ভালো করতে পারছে।

টিউমার বোর্ডে সার্জন, রেডিও অনকোলজিস্ট ও প্যাথলজিস্টের পাশাপাশি মলিকুলার জেনেটিক জিন বিশেষজ্ঞ থাকবেন, যিনি বলে দেবেন এ ক্যানসার প্রতিরোধে কোন ওষুধটি লাগবে।

ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যানসার হাসপাতালের দিকে তাকালে দেখা যাবে কেউ এখন আর ইনডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট দেয় না। রোগীকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশে ১৯৯১ এ টিউমার বোর্ড শুরু হয়েছিলো। তখন আমাদের খুব বেশি বিশেষজ্ঞ ছিল না। এখন এ সমস্যা কিছুটা দূর হয়েছে। আমি আহসানিয়া মিশনসহ সহ বাংলাদেশ স্পেসালাইজড হসপিটাল এবং চট্রগ্রাম মা-ও-শিশু হাসপাতালে কাজ করেছি যেখানে টিউমার বোর্ডের মাধ্যমেই চিকিৎসা দেয়া হয়। আমাদের উচিত প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে টিউমার বোর্ড করে ক্যানসার আক্রান্ত প্রতিটি রোগীর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এজন্য টেলি কনফারেন্সিংয়ের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অধ্যাপক ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন
চিফ কনসালট্যান্ট-মেডিকেল অনকোলজিস্ট, বিআরবি হাসপাতাল

আমাদের দেশে ক্যানসার চিকিৎসায় অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে। চারটি কেমোথেরাপির ওষুধ ও একটি রেডিয়েশন যন্ত্র নিয়ে ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের দিকে। আর এখন দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এর ভালো চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে।

রোগীদের সচেতনতা বেড়েছে। আমাদের রোগনির্ণয়ের সক্ষমতা বেড়েছে। বিভিন্ন আধুনিক নির্ণয়পদ্ধতি দেশে এসেছে। তবে আত্মতৃপ্তি বা আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। আমি বলব, এখনো অপ্রতুলতা রয়েছে। এ ছাড়া রোগ নির্ণয়ে নির্ভুলতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেশে একধরনের ফলাফল, আবার বিদেশে গিয়ে অন্য ধরনের ফলাফল পেতে দেখা যায়। এর চেয়ে বিব্রতকর কিছু হতে পারে না। ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ হিসেবে এখানে আমাদের ভূমিকা গৌন, মূল ভূমিকা প্যাথলজিস্টের। কাজেই এসব ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন আছে। একটি উন্নতমানের জেনেটিক ল্যাব এবং মলিকুলার (Molecular) ল্যাবরেটরি এদেশে অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের দেশে রেডিওথেরাপি মেশিনের অপ্রতুলতা আছে। যেখানে প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য একটি করে মেশিন দরকার, সেখানে আমাদের আছে মাত্র ২২ থেকে ২৫টি। অথচ আমাদের প্রয়োজন ১৬ কোটি জনগণের জন্য অন্তত ১৬০টি মেশিন। সবক্ষেত্রে কেমোথেরাপি শেষ হওয়ার পর রেডিওথেরাপির প্রয়োজন পড়ে। সরকারি হাসপাতাল তো বটেই, এখন বেসরকারি হাসপাতালগুলোয়ও রেডিওথেরাপি দিতে দীর্ঘ লাইন পড়ে। সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে রেডিওথেরাপি দেওয়ার কথা থাকলেও অনেকের সিরিয়াল পড়ে ৯ মাস পর। এখানেও আমাদের অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রায় সব ধরনের ক্যানসার চিকিৎসা আমাদের দেশে হচ্ছে। এমনকি ব্লাড ক্যানসারের ক্ষেত্রে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের কাজও আমাদের দেশে হচ্ছে। এ ছাড়া টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনো থেরাপি সহ বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রয়োগ সফলভাবে হচ্ছে।

রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসকদের সচেতন হতে হবে। কখন রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে, সে ব্যাপারে সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। হারবাল কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসার প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এই বিশেষ ভূমিকায় এনজিও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ারও ভূমিকা রাখতে হবে। ব্যক্তিগত সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি।

অধ্যাপক ডা. এহতেশামুল হক
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি, ল্যাবএইড ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার

ক্যানসার রোগনির্ণয়ের পর্যায়কে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে নিই : স্ক্রিনিং, দ্রুত শনাক্তকরণ ও সব রোগীর জন্য সচেতনতা।

জরায়ুর মুখের ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন স্ক্রিনিং সম্ভব হচ্ছে। স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'নিজেই স্তন পরীক্ষা' করার বিষয়ে আমরা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আমরা এই প্রচারণা করছি। এতে করে কিছু রোগী আমরা পাচ্ছি। অর্থাৎ সচেতনতার জায়গা থেকে শুরুতেই রোগীরা সাবধান হচ্ছেন।

স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। কিন্তু এটি করার মতো সুবিধা আমাদের অনেক জায়গাতেই নেই। যদিও আগের তুলনায় এখন আমরা অনেক ভালো অবস্থায় আছি। কিন্তু এই অবস্থার আরও অনেক উন্নতি প্রয়োজন। পায়ুপথের ক্যানসার, মূত্রথলির ক্যানসারসহ বিভিন্ন ক্যানসারের চিকিৎসা আমাদের দেশে এখনো প্রোগ্রাম হিসেবে চালু করতে পারিনি।

আমি মনে করি, জাতীয় পর্যায়ে স্ক্রিনিংয়ের জন্য আরও অনেক প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। এতে করে দ্রুত প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্ত করা যাবে।

এখন মাল্টি ক্যানসার আর্লি ডিটেকশন-প্রক্রিয়া এসেছে, যদিও এখনো এটি অনুমোদন পায়নি। আমি আশাবাদী, বাংলাদেশে এটিও একসময় চালু হবে। এই প্রক্রিয়ায় এক ফোঁটা রক্ত থেকে প্রোটিন ও জিন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বলে দেওয়া যাবে ভবিষ্যতে ব্যক্তির কোনো ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি আছে কি না। এ ছাড়া ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে খুব দ্রুত ক্যানসার শনাক্ত করা হয়।

সাধারণ একটি সিবিসি পরীক্ষার মধ্য দিয়েও ক্যানসার শনাক্ত করা হয়। এ ছাড়া রেডিওলজি ও ইমেজিং গুরুত্বপূর্ণ। এক্স-রে মেশিন এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আছে। একটি এক্স-রে করেই এখন ফুসফুস ক্যানসারের প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এখন উপজেলা পর্যায়েও এই সুবিধা পাওয়া যায়। পাশাপাশি সিটি স্ক্যান ও এমআরআইয়ের মতো পদ্ধতিগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

বায়োপসির প্রসঙ্গে বলব, আমাদের দেশে অনেক অস্ত্রোপচার হয়, কিন্তু সে তুলনায় বায়োপসি, অর্থাৎ টিস্যু পরীক্ষা করা হয় না। অথচ শরীর থেকে কোনো টিস্যু নেওয়া হলে, সে টিস্যুর অবশ্যই হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা উচিত। আজকের আলোচনা থেকে আমি বার্তাটি সব চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

ডা. ফেরদৌস শাহরিয়ার সাঈদ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও কো-অর্ডিনেটর, অনকোলজিস্ট, এভারকেয়ার হাসপাতাল

আমরা ঢাকা শহরের বিবর্তন দেখেছি। সত্তরের দশকের মাঠ-ঘাট, বিল, নদী দেখেছি। সেগুলো এখন আর নেই। বাতাস দিন দিন দূষিত হয়েছে। এখন অল্প দূরেও দেখা যায় না। সব দিকে ধোঁয়াশা। ছোট বস্তুকণায় ভরে গেছে বাতাস। আশির দশকে যখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি, তখন বুড়িগঙ্গায় প্রচুর শুশুক পাওয়া যেত। যেখানে প্রচুর মাছ আর স্বচ্ছ পানি থাকে, সেখানেই শুশুক থাকে। এখন অনেক দূর থেকেই পানির গন্ধ পাওয়া যায়। পচা পানিতে আর শুশুক নেই। পানি বাজেভাবে দূষিত হয়ে গেছে। অনেকেই বলে, এসবের কারণে ক্যানসার হয়। তারা যে ভুল বলেন, তা নয়।

ক্যানসার চিকিৎসায় বাংলাদেশ নিশ্চয়ই এগিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের কী অবস্থা? তা জানতে হলে প্রয়োজন গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তনের। আমাদের কোথাও গ্রেড পদ্ধতি নেই। পাশের দেশ ভারতে প্রতিবছর ক্যানসার হাসপাতালগুলোর গ্রেডিং হয়। তারা সফলতার ক্রমতালিকা করে। তাদের কিছু মানদণ্ড আছে। আমাদের তো মানদণ্ডই নেই। কোনো ধরনের গ্রেড পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের অবস্থা কী, সেটি জানার কোনো উপায় নেই। আমাদের পরিস্থিতি কী, সেটি জানার জন্য মানদণ্ড ঠিক করতে হবে।

আমাদের দেশে শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। চিকিৎসাব্যবস্থা সমৃদ্ধ হয়েছে, ওষুধ দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। বিদেশি কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে তাদের ব্যবসা সীমিত করে ফেলেছে। কারণ, তাদের ওষুধের দাম বেশি। আমাদের জোর দিতে হবে মানদণ্ড নির্ধারণের দিকে। এতে হাসপাতালগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ফলে চিকিৎসার মান বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যাপক ডা. সাজ্জাদ মোহাম্মদ ইউসুফ
বিভাগীয় প্রধান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

২০২২ সালের তথ্যানুযায়ী সারা বিশ্বে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চসংখ্যক রোগী কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত। এ ছাড়া সপ্তম সর্বোচ্চসংখ্যক রোগী পায়ুপথের ক্যানসারে আক্রান্ত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দুটির অবস্থান যথাক্রমে ১৫তম ও ১৬তম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসার ভয়াবহ হলেও বিদেশে এ ক্যানসারে মৃত্যুহার একদম কমে গেছে।

অঞ্চলভেদে ক্যানসারের ধরনও আলাদা। যেমন দিল্লিতে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পাকস্থলী ও কোলন ক্যানসারের রোগীর সংখ্যা বেশি। ফরমালিনযুক্ত খাদ্য, ডিডিটিযুক্ত শুঁটকি মাছসহ প্রভৃতি কারণে এ ক্যানসার হচ্ছে। বিদেশফেরত কিছু তরুণ-যুবকের মধ্যেও ইদানীং কোলন ক্যানসার দেখা যাচ্ছে। ডায়েট পরিবর্তনের কারণে হয়তো এটি হচ্ছে। সাধারণত পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা স্ক্রিনিংয়ে জোর দিয়ে থাকি। তবে পরিবারে কারও যদি ক্যানসার হওয়ার ইতিহাস থাকে, তা হলে ব্যক্তির স্ক্রিনিং শুরু করতে হবে ৪০ বছর বয়স থেকে।

যে ক্যানসারই হোক, সব ক্ষেত্রেই আমাদের দক্ষ জনবল দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মলিকুলার ল্যাব প্রতিস্থাপন করা এবং সারাদেশের ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে অনকো নার্সিংয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়েজন। প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ক্ষেত্রেও আমাদের দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দরকার একটি জাতীয় নীতিমালা। নীতিমালার জন্য প্রয়োজন ক্যানসার রোগী রেজিস্ট্রিকরণের ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে দুটি সুবিধা হয়, রোগীকে ইনস্যুরেন্সের আওতায় আনা যায় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সাহায্য করা যায়। এ ছাড়া ক্যানসার কার্ড করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে রোগীরা সুবিধা পেতে পারেন।

অধ্যাপক ডা. আলীয়া শাহনাজ
বিভাগীয় প্রধান, রেডিওথেরাপি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ক্যানসার নিয়ে গত ৬ মাসে ৭ হাজার ৪৩৩ রোগী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নারী রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৭১৩। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই জরায়ুমুখের ক্যানসারের রোগী।

জরায়ুমুখের ক্যানসার দিন দিন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। তাই এটি প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, কী কারণে জরায়ুমুখের ক্যানসার হয়? এরপর আসে প্রতিরোধ, সচেতনতা ও সামাজিক ট্যাবু-সংক্রান্ত বিষয়।

জরায়ুমুখের ক্যানসারের প্রধান কারণ হলো হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। এই ভাইরাসের মাধ্যমেই ক্যানসার মানুষের শরীরে ছড়ায়। অধিক সন্তান গ্রহণ, বাল্যবিবাহ, বহুগামিতা ইত্যাদি জরায়ুমুখ ক্যানসার হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধূমপানের অভ্যাসও জরায়ুমুখের ক্যানসারের কারণ হতে পারে।

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকা দেওয়া হলো প্রাথমিক প্রতিরোধব্যবস্থা। টিকা দিলে ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যায়। স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে দ্বিতীয় ধাপের প্রতিরোধব্যবস্থা।

অনেক ধরনের ক্যানসারের স্ক্রিনিং করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্য হলো, জরায়ুমুখের ক্যানসার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা সম্ভব। এতে ক্যানসার সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও শনাক্ত করা যায়। এ কারণে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়।

সামাজিক ট্যাবু ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বাধা। সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

এ কে এম আনোয়ারুল হক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

অত্যাধুনিক অ্যান্টি-ক্যানসার ওষুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। ২০১৫ সালেও ক্যানসার চিকিৎসার প্রায় ৯০ শতাংশ ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ ওষুধই বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ESMO ASIA- 2023-এ এভারেস্ট ফার্মার স্টলে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় তিনটি ফার্মার একটির ভারতীয় প্রধান আমাদের স্টলে এসেছিলেন ধন্যবাদ জানাতে। কারণ, এভারেস্ট ফার্মার ওষুধে তাঁর বাবা চিকিৎসাধীন। এটি আমাদের দেশীয় ওষুধের ওপর দেশি-বিদেশি শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের আস্থার প্রতিফলন।

শ্রীলঙ্কা, নেপাল কিংবা ভুটানের মতো আমাদের দেশেও ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সেবা কার্ড বা স্কিমের প্রবর্তন করা আজ সময়ের দাবি।

এক বছরে প্রায় ১০০টি ওষুধের কাঁচামালের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে এভারেস্ট ফার্মাও বিভিন্ন ক্যানসার ওষুধের দাম সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। সরকারের দিক থেকে বিশেষত অ্যান্টি-ক্যানসার ওষুধের রপ্তানির ওপর প্রণোদনার হার যদি ১৫ শতাংশ করা হয়, তা আমাদের রপ্তানিতে সাহায্যে করবে এবং দেশের ইমেজ বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং মলিকুলার ল্যাব স্থাপন এখন ক্যানসার চিকিৎসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে। এই টেস্টগুলো যেহেতু অনেক ব্যয়বহুল, তাই সরকারিভাবে যদি আমরা এ রকম একটি ল্যাব স্থাপন করতে পারি, তবে রোগীদের এই টেস্টগুলো অনেক সুলভ মূল্যে করে দেওয়া সম্ভব হবে।

৪ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব ক্যান্সার দিবস
Everest
Pharmaceuticals Ltd.